OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 283
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 272 - 283
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সেলিনা হোসেনের ‘সোনালি ডুমুর’ : ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়

ড. শ্রীতা মুখার্জী
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
জাকির হুসেন দিল্লী কলেজ, নিউ দিল্লী
Email ID : shri.beng@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Cultural, expanded, spatial, complementary, minority, historical, humanitarian, riot, representation.

Abstract
Selina Hosen's 'Sonali Dumur' tells a story of partition. Here, in this paper, an attempt has been taken to analize the novel. This novel emphasizes on the life of those people who belonged to working class. After 1947, they chose to stay in East Pakisthan, which was their motherland. But they suffered the most. It focused on the life of Animesh, a boy from Bengali Hindu minority family. After a long struggle, he became a doctor. But the partition issue, his stand as a Hindu, and his transformation is an important part of this novel. In totality, this novel wants to portray the landscape of this partition and its socio-economic relevance. It tells about 'Danga' – Riot, which changes the history of a country and which is a never ending process even in today's era. But the riot had a different form at the time of partition of India. That sensitive issue has been handled in a very intelligent manner by the author. Such matters has been discussed in this paper.

Discussion

“ঢাকায় হিন্দু আছে দাদা?
হ্যাঁ, আছে তো।
তাহলে ঢাকায় দাঙ্গা হয়।
দাঙ্গা! অনিমেষের মুখ শুকিয়ে যায়।
ঢাকা তো দেশের রাজধানী। ওখানে শিক্ষিত লোকেরা থাকে। ওখানে বোধহয় দাঙ্গা হয় না।”[১]
(‘সোনালি ডুমুর’, সেলিনা হোসেন)

সেলিনা হোসেনের উপন্যাস ‘সোনালি ডুমুর’ হল এক ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের প্রকাশকাল ২০১২ সাল। দেশভাগের রক্তাক্ত অধ্যায়কে নিজের মর্মমূলে প্রোথিত করে সটান মাথা উঁচু করে থাকে এই উপন্যাস। দেশভাগের যন্ত্রণার পাশাপাশি এখানে বলা হয় প্রেম-রোমাঞ্চ-উন্মাদনার এক স্বপ্নসফল অভিযানের কথাও। ইতিপূর্বে দেশভাগ নিয়ে লেখা হয়ে

গেছে অজস্র গল্প-উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ। তবুও পাঠক দেশভাগের বিষয় নিয়ে ফিকশন লেখা হলে নড়েচড়ে বসেন। তাঁরা আশা করেন নতুন কোন ভাবনার প্রতিফলন হয়ত দেখতে পাওয়া যাবে। শুধু যদি দেশভাগ হত এই উপন্যাসের বিষয়, তাহলে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি বলে একে খারিজ করা যেতে পারত হয়ত, কিন্তু এখানে দাঙ্গা পীড়িত পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুসম্প্রদায় অধ্যুষিত গ্রাম ও নগরগুলির নিজস্ব সাংস্কৃতিক বাতাবরণের চিত্র এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। ঔপন্যাসিকের সমাজ সমীক্ষার ফসল এই উপন্যাস। সংখ্যালঘু শ্রেণীর পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ডে অবস্থানের এক রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা এই উপন্যাসকে পাঠকের মর্মতন্তুর সঙ্গে বেঁধে ফেলে। যারা ছেড়ে গেল, তাদের জীবন-পাঁচালী নয়, বরং যাদের ছেড়ে গেল, তাদের জীবনের কথাই এখানে উঠে এসেছে।

২০১২ সালের অনেক আগেই সেলিনা হোসেন কর্তৃক লেখা হয়ে গিয়েছিল 'যাপিত জীবন' উপন্যাসটি। এরও বিষয় সেই দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা। এখানেও এক বাঙালি মুসলমান পরিবার ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে এসে দাঁড়ায় খালি হাতে। ইঁটের পর ইঁট সাজিয়ে জীবনকে আবার গড়ে তোলার ইতিকথা বর্ণিত হয় 'যাপিত জীবন'-এ। এই লেখাকে দেশভাগের ইতিহাস থেকে শুরু করে ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায় ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছেন লেখিকা। এই উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সাহিত্য সমালোচক সুদক্ষিণা ঘোষ বলেন,

> "যাপিত জীবন - উপন্যাসের কেন্দ্রে অবশ্যই আছে ভাষা-আন্দোলনের দুর্মর আবেগ, সেই একই বিস্ময়- এত রক্ত, জননী বাংলা ভাষা, এত রক্ত ছিল আমাদের শীর্ণ শরীরে! কিন্তু ইতিহাসের পটভূমিকা তার আগের প্রজন্মকে নিয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে ইতিহাসের আরেক ভাঙনের ছায়াছবিতে, দেশভাগের প্রত্যক্ষ ফল ছিন্নমূল পরিবারের নতুন শিকড় খোঁজার যন্ত্রণায়।"[২]

এখানেও ভাষার কাব্যময়তা পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়। এখানেও আছে পরিবার, প্রেম, বিদ্রোহের মশাল জ্বলে ওঠা। এখানেও আছে সেই শিকড় ছেঁড়ার যন্ত্রণার কথা। সেভাবে দেখতে গেলে 'সোনালি ডুমুর'-কে এই উপন্যাসের 'খণ্ড – ২' মনে হওয়াও অসম্ভব নয়।

১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়কালকে 'সোনালি ডুমুর' উপন্যাসের সূচনার ঘটনাক্রম হিসাবে ধরতে চাওয়া হয়েছে। মধ্যবিন্দুতে কাহিনী শুরু করে এগিয়ে-পিছিয়ে গিয়ে গল্প বলা হয়েছে। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র বালক অনিমেষের জীবনধারার অগ্রগতির সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে ঘটনার সময়কালকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামে বসবাসকারী অমিয়নাথ রায় নামক এক সোনার কারিগর এবং তার পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে কাহিনী বয়ন করে চলেন ঔপন্যাসিক। কেন্দ্রিয় চরিত্রের নামকরণ ও পদবী পরিচয় থেকেই বোঝা যায়, একটি হিন্দু পরিবারের জীবনের বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রাকে তুলে ধরে ইতিহাসকে নিজের শরীরে ধারণ করে উপন্যাসের ঘটনার ধারা এগিয়ে চলে। সচেতন ভাবেই হয়ত এখানে উচ্চবর্ণের শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী হিন্দু সম্প্রদায়কে নয়, বরং স্বর্ণকার পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সমাজের এই বণিক-শ্রমিক-কারিগর শ্রেণীর পরিস্থিতি ও তার সংগ্রামকে চিনিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে। ১৯৪৬-এর নোয়াখালির দাঙ্গা, দাঙ্গার অস্থির পরিস্থিতিতে গান্ধিজীর গ্রাম পরিদর্শন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে দেশে দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণার সম্প্রসারণ, গান্ধীবাদী দর্শনের প্রচার, এনিমি প্রপার্টি অ্যাক্টের ইমপ্লিমেন্টেশান, নজরুল ইসলামের স্বদেশপ্রীতি ও অসাম্প্রদায়িক অবস্থান, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সুচেতা কৃপালনি জাতীয় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের নামের আনাগোনা, পঞ্চাশের দাঙ্গা, পূর্ব পাকিস্থানে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ এই উপন্যাসকে ইতিহাসের তথ্যভারে সমৃদ্ধ করে তোলে ক্রমশই। শুধু তো ইতিহাস নয়, ভূগোলের ব্যাপ্তিও এখানে কিছু কম নয়। দেওভোগ থেকে শুরু করে চাকদহ-নদীয়া-চাঁদপুর-কুমিল্লা-ঢাকা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে কাহিনীর যাত্রাপথ। ১৯৪৭ পরবর্তী দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার দেওভোগ গ্রাম ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিতে গিয়ে সেখান থেকে খালিহাতে ফিরতে হয় এই স্বর্ণকার পরিবারকে। পশ্চিমবঙ্গে যেমন অপেক্ষা করে ছিল আপনজনের থেকে পাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যদিকে পূর্ববাংলার দেওভোগে তাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল প্রতিবেশীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-তিরস্কার। দেওভোগে স্থানীয় সাম্প্রদায়িক মানুষগুলির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গ্রাম ছেড়ে অন্য ভুবনের উদ্দেশ্যে

যাত্রা করেন তাঁরা। চাঁদপুরের মাটিতে আবার ভাঙা সংসার জোড়া লাগে। ব্যবসার জোগাড় হয়। সন্তান-সন্ততির স্কুল-পড়াশোনার ব্যবস্থা বহাল হয়। এই চাঁদপুর গ্রামকে পটভূমি করেই উপন্যাসের নায়ক চরিত্র 'অনিমেষ'-এর ছাত্রজীবনকে সম্পূর্ণতা দিয়ে তাকে উচ্চশিক্ষার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছেন লেখিকা সেলিনা হোসেন। দেওভোগ থেকে চাঁদপুর গ্রাম হয়ে প্রথমে অনিমেষ নামক অমিয়নাথের মেধাবী সন্তানটি কলেজে পড়তে কুমিল্লায় যায়। তারপর অনিমেষের যাত্রাপথকে সম্প্রসারিত করে তাকে ঢাকার মেডিকেল কলেজে পৌঁছে দেওয়া হয়,

> "মেঘনা থেকে শীতলক্ষ্যা হয়ে বুড়িগঙ্গায় এসে সদরঘাটে নামে অনিমেষ। এই প্রথম নদীপথের একটি লম্বা যাত্রা হল ওর। লঞ্চ থেকে নেমে শ্বাস টেনে বলে, বাবা ঢাকার বাতাস বুকের ভেতর নিতে বেশ লাগছে। মনে হচ্ছে ঢাকা আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে।"[৩]

'অনিমেষ' – অমিয়নাথ-সরোজিনীর বুদ্ধিমান, মেধাবী ও সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী সন্তান। উপন্যাসের সূচনা থেকেই যে তিনটি শব্দ ধ্রুবপদের মতো অনিমেষকে এবং তার সঙ্গে উপন্যাস-পাঠককে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় তারা হল – 'দাঙ্গা', 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' এবং 'প্রকৃতি'। এই 'অনিমেষ' চরিত্রটিকে পথে-প্রান্তরে, ফুল-পাখি-লতাপাতায় মিশিয়ে দিয়ে পূর্ব বাংলার স্থানিক প্রকৃতির বর্ণময়তাকে, তার শোভাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। তারই চোখ দিয়ে মূলত ব্যক্তি ও বস্তু, ঘটনা ও পরিবেশকে পাঠককে প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতে অনিমেষের বয়স দশ বছর। দেওভোগ গ্রাম থেকে পথচলা শুরু করে নদীর পরে নদী, গ্রামের পরে গ্রাম পেরিয়ে এসে এই অনিমেষের চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে ঢাকা শহরের মানুষের মিছিল ও তার সংস্কৃতি-রাজনীতির বৈভিন্নকে। 'পথের পাঁচালি'-র অপুকেও এভাবে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার সাক্ষী থাকতে হয়েছিল। তবে 'অপু'-র থেকে এখানেই অনিমেষের স্বাতন্ত্র্য যে এই গোটা যাত্রাপথে অনিমেষ পাশে পেয়েছে পিতা অমিয়নাথকে। তফাৎ আরো আছে অবশ্য। অনিমেষের সুদীর্ঘ এই যাত্রাপথের সঙ্গে মিশে রয়েছে মাধুরী। মাধুরীলতা। বলিউডি ছবির প্রবল দাপটে বাঙালি পাঠক 'মাধুরী' নামটির সঙ্গে পরিচিত। এই নামের আবেদন তাদের কাছে অনেকখানি। সেই রূপবিভঙ্গের মৃত্তিকাতেই যেন নিজের 'মাধুরী' চরিত্রকে গড়েছেন লেখিকা। এই 'মাধুরীলতা' চরিত্র অনিমেষের নির্মাণ প্রকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপু'-চরিত্রের শৈশব-কৈশোরের হয়ে ওঠায়, গঠনপ্রক্রিয়ায় এই নারীমৃত্তিকার মিশেল ছিল না। অনিমেষ-মাধুরী চরিত্রদ্বৈত কিশোরকাল থেকে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের কাহিনীকে কাঁধ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

'সোনালি ডুমুর' কি প্রেমের উপন্যাস? কাহিনীর এগিয়ে চলা থেকে সেরকমই কিছুটা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। উপন্যাসের সপ্তম অধ্যায় থেকেই মাধুরীলতা-অনিমেষের বন্ধুত্বে ফাগের রঙ লেগেছে। সম্পর্কের সেই রঙ ঘনীভূত হয়েছে মাধুরীলতার দিদিমার আকস্মিক প্রয়াণের ঘটনায়। সমাজের চোখে তা আর গোপন থাকেনি। তবে নিজেদের সম্পর্ককে গোপন করার প্রয়াসও যেন লক্ষিত হয় না এই দুই চরিত্রের মধ্যে। নিজেদের সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে কোনো 'চোরা আবেগ' নয়, বরং খোলামেলা আত্মঘোষণার ভঙ্গি এই উপন্যাসকে আধুনিকতা দেয়। এবং এই প্রেমের সম্পর্ক আসলে প্রতিবাদ হয়ে ওঠে। মনে রাখা দরকার এই উপন্যাসের সময়কাল ১৯৫০-৫৫ সাল। সেকালের বিচারে অনিমেষ-মাধুরীলতার প্রেমসম্পর্ককে যথেষ্ট আধুনিক এবং অভিনব বলেই মনে হয়। সামাজিক বিভীষিকার মুখে দাঁড়িয়ে, সমাজ-প্রণেতাদের কুটিল দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে, সাহিত্যে 'রক্তকরবী'-র নন্দিনী আর রঞ্জনের মতো 'হাহা হাসির' এক প্রতিবাদকে রেজিস্টার করা হয়েছে। এই প্রতিবাদে আছে নতুনত্ব। আছে ভিন্নতা।

> "১৯৪৭-এর পর থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে অবিরাম ধারায় বাস্তুহারা দুর্ভাগা মানুষদের পশ্চিমবঙ্গে আগমন চলতেই থাকে। ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্গমনের ধারা বহু গুণ বেড়ে যায়।"[৪]

– 'মরিচঝাঁপি' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধের এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় ১৯৬৫ সাল এবং তার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের নানা জেলায় বসবাসকারী মানুষেরা দেশ ছাড়তে শুরু করেছিল। সেই উক্তিরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় 'সোনালি ডুমুর'-এ। এখানে অমিয়নাথের উক্তি থেকে বোঝানো হয়েছে, আরো আগেই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা গ্রাম ছেড়েছে। থেকে গেছে শুধু

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 283
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কর্মীমানুষের দল। তারা তখনো পূর্ব পাকিস্তানের ওপর থেকে নিজেদের দাবী প্রত্যাহার করতে নারাজ ছিল। যে পঁয়ষট্টির দাঙ্গার উল্লেখ ছিল 'মরিচঝাঁপি' বইটিতে, সেই দাঙ্গাকে ঢাকা থাকাকালীন নিজের অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করেছে অনিমেষ।

'সোনালি ডুমুর' উপন্যাসটি এখানে এক দাঙ্গা থেকে শুরু করে অপর দাঙ্গায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় প্রাণে বেঁচে ফেরা মানুষ চৌষট্টির দাঙ্গার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাষা হারিয়েছে, বাক্রুদ্ধ হয়েছে –

> "...ছেচল্লিশের দাঙ্গায় তুমি রক্তে ডুবে বেঁচে গিয়েছিলে। চৌষট্টির দাঙ্গায় আমি একসোডাসের সহযাত্রী।"[৫]

১৯৪৬ এবং ১৯৬৪ - এই দুই সাল-তারিখকে নামাঙ্কিত করা মানে কিন্তু এমন মনে করার কোন কারণ নেই যে এর মধ্যবর্তী বিন্দুগুলিতে শান্তিতে ছিল মানুষ। আসলে ১৯৪৬ ও ১৯৬৪-এর মাঝের সময়ে অনেকগুলি সরলরেখায় দিন কাটাচ্ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু রেখাগুলি কেউই কারুর সাথে মিলতে পাচ্ছিল না, বা বলা ভালো একে অপরের সাথে মিলতে এবং এক বৃত্ত বা চতুষ্কোণ রচনা করতে সাহস করছিল না। তাড়া খাওয়া গবাদিপশুর মতোই এসময় ছিল মানুষেরও বেঁচে থাকা। এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন অনিমেষ-মাধুরীলতা প্রেমের বৃত্ত রচনার সাহস দেখায়, তখন তারা হয়ে যায় ব্যক্তিক্রমী চরিত্র-যুগল।

অমিয়নাথের দুই ছেলে, দুই মেয়ে আর স্ত্রী সরোজিনীকে নিয়ে ছোট সংসার। সেই আপাতসুখী, শান্তিপ্রিয় পরিবারের আদি গ্রাম দেওভোগ ছেড়ে চলে এসে চাঁদপুরে বাসা বাঁধা। ছেলে হারাণের পারিবারিক পেশায় যুক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হওয়া, অনিমেষের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চিকিৎসকের জীবিকায় নিয়োজিত হওয়া, মেয়ে শীলার বিয়ে দিতে পারা এবং সর্বোপরি সরোজিনী-অমিয়নাথের পরস্পরের অবলম্বন হয়ে প্রেম-বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকাই 'সোনালি ডুমুর'-এর আখ্যান রচনা করে। অনিমেষ-মাধুরীলতার 'প্রেম' উপন্যাসের ঘটনাশৈলীতে রোমাঙ্গরসের আমদানী করে। আর 'অনিমেষ' চরিত্রের সকল বাঁধা ঠেলে সামনের দিকে এগোতে চাওয়ার দুর্বার বাসনাই আসলে উপন্যাসের কাহিনীক্রমকে গতি প্রদান করে।

উপন্যাসের মূল পরিসরকে কুড়ি বছরের মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়েছে। ২৯৪ পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ উপন্যাসে দাঙ্গার নতুন পরিভাষা খুঁজতে চাওয়া হয়েছে। দেশভাগের ফলে তৈরি হওয়া নতুন এক বহু প্রচলিত শব্দ 'রিফিউজি'-এর সঙ্গে পাঠক যেমন পরিচিত হচ্ছে, তেমনই এই লেখায় 'রিফিউজি'-র নতুন এক বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে – 'শরণার্থী'। 'রিফিউজি' (উপন্যাসে 'উদ্বাস্তু' শব্দের পরিবর্তে এই 'রিফিউজি' শব্দের ব্যবহারই পরিলক্ষিত হয়) শব্দের মধ্যে তাড়া খাওয়া কঙ্কালসার মানুষের দলকে যেমন মানসদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা যায়, 'মালাউন' শব্দে যেমন আছে দেশহীন মানুষকে দাগিয়ে দিয়ে অপরিসীম লাঞ্ছনা ও অপমান দেওয়ার ইতিবৃত্ত, তেমনই 'শরণার্থী' শব্দের মধ্যে পরম মমতায় মানুষের শিকড়হীনতার যন্ত্রণাকে-ক্ষতকে যেন ঢেকে রাখতে চাওয়ার প্রয়াস পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। 'দাঙ্গা' শব্দের অভিঘাত এই কথনে ভিন্ন মাত্রা নিয়ে আসে। 'সোনালি ডুমুর' পাঠককে বুঝিয়ে দেয় দেশভাগজনিত এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পেছনে ধর্ম বৃহৎ ভূমিকা পালন করে না আসলে। কিছু স্বার্থসন্ধানী মানুষ ধর্মকে উপলক্ষ্য করে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে দাঙ্গা বাঁধায়, এই সত্যিই উঠে এসেছে সাহিত্যে। 'দেশভাগ' ও তৎপরবর্তী 'দাঙ্গা' সম্পর্কিত এই বিশেষ পর্যবেক্ষণ 'সোনালি ডুমুর'-কে এক পৃথক মর্যাদা প্রদান করে। হ্যাঁ, দাঙ্গা-কে বিভিন্নভাবে দেখা হয়েছে এই উপন্যাসে। কয়েকটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে দাঙ্গা সম্পর্কিত মানুষের মধ্যেকার গড়পরতা মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে –

১) "...মানুষের হাতে মানুষের মরণই দাঙ্গা? পুরুষের হাতে নারীর শারীরিক নির্যাতন দাঙ্গা? বাড়িঘর লুট হওয়া দাঙ্গা? দাউদাউ জ্বলে ওঠা দাঙ্গা।"[৬]

২) "যে মানুষ ছেচল্লিশ দেখেছে তার আর দাঙ্গা বুঝতে হবে না। এখনকার লড়াই সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার লড়াই। এটা মোকাবিলা করেই বাঁচতে হবে।"[৭]

৩) "দাঙ্গাই তো। আমাদের ভূসম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার দু'মাসের মাথায় দিদিমা মরে গেল। অন্যায়ভাবে দখল করা তো দাঙ্গাই। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় আমার মাকে কেটে টুকরো করা হয়েছিল, এবারের দাঙ্গায় গেল দিদিমা।"[৮]

৪) ''সুহাস অনিমেষের হাত আঁকড়ে ধরে। খুব শক্ত করে।...বাদামের একটা টুকরো মুখে পুরে বলে, দেশভাগের আগে একটা দাঙ্গা হয়েছিল। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান হয়েছে। তারপরও মানুষ শান্তিতে নাই। নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এরপরও এই দেশে দাঙ্গা থামবে বলে আমার মনে হয় না অনিমেষ। এমন ঘটনা আরও ঘটবে। আরও।''[৯]
৫) ''সতীশ চারদিকে তাকায়। বুকভরে শ্বাস টেনে বলে, গ্রামটা খুব সুন্দর। কাজিরখিল গ্রামটা একসময় সুন্দর ছিল। দাঙ্গার পরে ওটার সৌন্দর্য মরে গেছে। যেদিকেই হাঁটি না কেন সবদিকেই শুধু মরা ঘাস আর দম-আটকানো বাতাস।''[১০]
দাঙ্গা সংক্রান্ত উপরোক্ত উদ্ধৃতির জবাবে উপন্যাসের শেষে ১৯তম পরিচ্ছেদে এসে ফয়াজ আহমদ ও অনিমেষের কথোপকথনে উঠে এসেছে দাঙ্গার প্রকৃত চরিত্রটি, ''দাঙ্গা কেন হয়। ...এর পেছনে বড় ধরনের স্বার্থ থাকে অনিমেষ। লোভ, ক্ষমতার দম্ভ, নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কারণে মানুষ মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর হয়।''[১১] এ হয়ত ঔপন্যাসিকের নিজেরও কথা। কিন্তু এর পরে সেই একই পরিচ্ছেদে 'দাঙ্গা'-র এক নবতম পরিভাষা পাওয়া যায়, সেটি হল 'একসোডাস'। দাঙ্গা যদি হয় একক বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এই একসোডাস তাহলে ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত এক পদক্ষেপ, যেখানে এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে গৃহহীন, দেশহীন করার ষড়যন্ত্র করা হয়। এবং সেই পরিকল্পনার রূপায়নে রাষ্ট্র ও তার শাসক ভীষণ রকম তৎপর হয়ে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানে দেশভাগ পরবর্তীকালে সংখ্যালঘু হিন্দু বাঙালিদের ওপর মুসলমান সম্প্রদায়ের অত্যাচারের কথা যেমন এসেছে, তেমনই অসাম্প্রদায়িক বাঙালি মুসলমান চরিত্রের মুখে এ কথাও শোনা যায় যে এই অত্যাচার প্রধানত আসছে বিহারী-পঞ্জাবী মুসলমানদের দিক থেকে। অনিমেষের উদ্ধত প্রশ্নের মুখে পড়ে এভাবেই নিজের উত্তর সাজিয়েছে আশরাফ,

> ''এদেশে বিহারিরা আছে অনিমেষ। ওরা বাঙালি মুসলমানদের দেখতে পারে না। ...ওরা ধর্মে মুসলমান হলেও ওদের মধ্যে বাঙালি-বিহারি বিরোধ আছে অনিমেষ।''[১২]

এই একই ধরনের কথা ফয়েজ আহমদও বলেছে,

> ''দেশভাগের সময় ভেবেছিলাম ভালই হয়েছে হিন্দুদের আধিপত্য থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। সাতচল্লিশের কয়েক বছর পরে দেখতে পাচ্ছি আমরা পঞ্জাবিদের অধীনে আছি। এর সঙ্গে আছে এদেশের বিহারিরা। এরা হল গোদের ওপর বিষফোঁড়া। এদের যন্ত্রণা অসহনীয়।''[১৩]

এভাবেই অবিচার-অত্যাচারের ভৌগোলিক সীমানির্দেশ কোথাও যেন উত্তর খোঁজার, ইতিহাসকে ঘুরে দেখার এবং জবাবদিহির প্রয়াস বলে মনে হয়। এখানে শুধু হিন্দু বাঙালি নয়, বরং অপামর বাঙালি জাতির ওপর পঞ্জাবি-বিহারিদের অত্যাচারের এবং বিহারি-বাঙালিদের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা যেমন এসেছে, তেমনি তার পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুঃখকষ্ট-যন্ত্রণার সঙ্গে সমান্তরালে কলকাতা তথা ভারতবর্ষে ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু মুসলমান মানুষের ওপর হয়ে চলা অত্যাচারের কথাও উঠিয়ে আনা হয়েছে। তৃতীয়ত পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাস্রোতে মুসলমান সম্প্রদায়ের জাত্যাভিমানী অত্যাচারী মানুষের দাপটের সমান্তরালে মুসলমান উদার, নিরহঙ্কারী চরিত্রকে কাহিনীতে এনে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। একটি সাম্প্রদায়িক, অনুদার চরিত্রের পাশে অপর ধর্মীয় উদার, মানবিক চরিত্র এনে কনট্রাস্ট তৈরি করে দেশ-জাতির চরিত্রকে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রদানের প্রয়াস লক্ষ করার মতো বিষয়। উপরোক্ত বিষয়গুলিকে কাহিনীতে এনে আসলে দেশকাল-রাজনীতির সাপেক্ষে 'পাওয়ার রিলেশান'-এর চরিত্রটিকেই কি খুঁজে বার করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক? সেরকমই কোন একটা ফর্মুলাকে দাঁড় করানোর প্রয়াসই এই উপন্যাসে পাওয়া গেছে। আর তাই এটি দেশভাগ সম্পর্কিত শুধু একটি সাহিত্য হয়ে রয়ে যায় না। সাহিত্যের অন্তরালে রাজনীতি, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্বের মতো জটিল গবেষণালব্ধ বিষয়কেও কাহিনীতে অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন সেলিনা হোসেন।

এই উপন্যাসে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ এসেছে একাধিকবার। প্রথমেই পাঠক জানতে পারেন ভারতবর্ষের নদীয়াতে নিজগৃহ থেকে প্রফুল্ল কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে মাথা নিচু করে অমিয়নাথ গ্রামে ফিরেছে। তারপরেই উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিম্ববতী-সরোজিনীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে উচ্চারিত হয় সেই অনিবার্য সত্য –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 283
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "...দেশটা ভাগ না হলে এমনটা বোধহয় হত না। মুসলমানদের সঙ্গে আমরা তো মিলেমিশেই ছিলাম দিদি। এখন ওরা আমাদেরকে বিশ্বাস করে না। ইন্ডিয়ার মুসলমানরাও আমাদের মতো অবস্থায় পড়েছে। সবই আমাদের ভাগ্য।"[১৪]

সুবোধনাথ প্রফুল্লর আলাপচারিতায় সেই একই সুর ধরা পড়েছে,

> "এমন দাঙ্গা বারবারই লাগতে পারে। ওই দাঙ্গার পরই তো তোমরা ঠিক করেছিলে যে এদেশে থাকবে না। তখন তো ভারতের অনেক জায়গায় দাঙ্গা হয়েছিল। শুধু নোয়াখালির কথা বলছিস কেন? কারণ নোয়াখালি আমাদের বাড়ির কাছের এলাকা। আমরা পঞ্জাবের দাঙ্গা দেখিনি। বিহারও না।"[১৫]

নোয়াখালির দাঙ্গার প্রসঙ্গ যখনই এসেছে, তার পাশে তুলে ধরা হয়েছে ছেচল্লিশের কলকাতা-বিহারের দাঙ্গারও চিত্র, যেখানে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর হয়েছিল অত্যাচার, "নোয়াখালির দাঙ্গার দু'আড়াই মাস আগে দাউদাউ পুড়েছে কলকাতা। বাড়িতে-রাস্তায় বয়েছে রক্তগঙ্গা। প্রাণ হারিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। সংখ্যায় বেশি মুসলমানেরা। মুসলমান নিধনের খবরে বেশি প্রভাবিত হয়েছে নোয়াখালির মানুষ। ছেচল্লিশের কলকাতার রক্তস্রোতের পরিণতি নোয়াখালির মর্মান্তিক নৃশংস পরিণতি।"[১৬] ঢাকায় থাকাকালীন ইন্দিরার জবানীতে অনিমেষ শুনেছে ১৯৫০-এর দাঙ্গার খবর, "এখন থেকে কয়েক বছর আগের কথা। ভারতের জব্বলপুরে দাঙ্গা বেঁধেছে। শত শত মানুষ নিহত হয়েছে। বেশিরভাগ মুসলমান। খবরটি পূর্ববঙ্গে আসতে সময় লাগেনি। সেটি ছিল মধ্যরাত..."[১৭] এই দাঙ্গা ডাক্তার নন্দীর পরিবারকে এক দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। সেই দাঙ্গাই 'সোনালি ডুমুর'-এর উপসংহারকে সূচিত করেছে, যেখানে ফয়েজ আহমদ 'শুকনো মুখে' অনিমেষকে বলেছে যে কাশ্মীরের মসজিদে ঘটে যাওয়া এক ঘটনার প্রতিবাদে পাকিস্তানের বিহারিরা ক্ষেপে উঠেছে এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জীবন নিয়ে তারা এর প্রতিশোধ নিতে চাইছে। এক অপরাধ অপর অপরাধের জাস্টিফিকেশান হতে পারে না যেহেতু, তাই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক ধরে নিতে পারেন এক দাঙ্গার আগুন কিভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে সীমারেখার অপর প্রান্তকেও, উপরোক্ত উদ্ধৃতি নিশ্চয়ই তারই সমীকরণ প্রদান করে। নোয়াখালির শায়েস্তাগঞ্জের জমিদার চিত্তবাবুর হত্যার প্রসঙ্গ থেকে এভাবেই লাইমলাইট চলে যায় কলকাতার ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর হওয়া অত্যাচারের ওপর এবং শেষ পর্যন্ত আলো এসে থেমেছে 'ওহ মানুষ, মানুষ!'-এ। হ্যাঁ, এই হল লেখিকার আসল উদ্দেশ্য। তিনি দেশভাগের এই উপন্যাসে বোঝাতে চেয়েছেন, এপার দাঙ্গা ওপার দাঙ্গা আসলে কিভাবে মানুষকে-জীবনকে-মনুষ্যত্ব-উত্তরাধিকারকে নির্মূল করে।

২৫ পরিচ্ছেদের উপন্যাসে চরিত্রের মিছিল লক্ষ্য করা যায়। সরোজিনী-অমিয়নাথ-অনিমেষ-মাধুরীলতা ছাড়াও অজস্র ছোটো-বড় চরিত্রের আনাগোনা। চরিত্রদের ঘটনার স্রোতে আসা-যাওয়ায় একটা বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যখনই কোন সাম্প্রদায়িক চরিত্রের আগমন ঘটে, ঠিক তারই সমান্তরালে এক বা একাধিক অসাম্প্রদায়িক, উদার, মহৎপ্রাণ চরিত্র এসে ঘটনার পাকিয়ে তোলা জটকে খুলতে সাহায্য করে। এই কথন প্রকরণ কাহিনীতে বারংবারই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মুসলিম লিগের পাণ্ডা ওয়াহেদ মিয়া যখন অমিয়নাথকে গ্রাম ছাড়ার কথা বলে প্রকাশ্যে অপমান করে, তখন তার পাশাপাশি কালামের মা, মিনুর মা, মনসুর, ইলিয়াসের মতো চরিত্রের আবির্ভাব হয়েছে যারা নিজের গাছের ফল, পুকুরের মাছ, ক্ষেতের শাকসবজী দিয়ে অমিয়নাথের পরিবারকে বন্ধুত্বের, নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে চেয়েছে। চাঁদপুরে আসার পর অনিমেষের গভীর বন্ধুত্ব হয়েছে আশরাফ আর মোস্তফার সঙ্গে। অনিমেষের স্কুলে মুজিবুল যখন সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে অনিমেষকে একঘরে করতে চেয়েছে, তখন তার পাশে দাঁড়িয়েছে জহির ও তমিজ। স্কুলের হেডমাস্টার ওয়ালি মুসলিম লিগের রাজনীতিকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলতে চাইলে তার প্রতিবাদে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন গ্রামের মৌলবি হাসানুদ্দিন। তিনি এক অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তিনি নিজেকে জড়িয়ে রাখেন। প্রকৃতই এক ধর্মপ্রাণ চরিত্র এই হাসানুদ্দিন। ধর্মের উপাসক হয়েও ধর্মকে তিনি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেননি। অথচ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষার পেশায় নিয়োজিত হয়েও ধর্মের প্রয়োগে ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছোতে চেয়েছেন। 'ধর্ম' আসলে একটি উপলক্ষ্য মাত্র। কখনো তা মানুষকে উদারতা দেয়, কখনো বা সঙ্কীর্ণ করে তোলে মানুষের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 283
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মনকে – এই সত্যই 'হেডমাস্টার-মৌলবি' চরিত্রযুগল কর্তৃক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ঢাকা শহরেও দেখা মেলে ফয়েজ আহমেদের মতো অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের যিনি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের নিগ্রহ থেকে ডাক্তার নন্দীর জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন বিপন্ন করতে পারেন। কালো চরিত্রের ছায়া দীর্ঘতর হওয়ার আগেই এভাবে সরল-উদার-মহৎপ্রাণ চরিত্রের আগমন ঘটিয়ে ঘটনার গতিকে প্রাণবন্ত করে তোলা হয়। ভালো-কালোর সমন্বয়ে একটি দেশের একটি জাতির আসল মুখটি চিনিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বর্তায় কথাসাহিত্যিকের ওপরে। সেই দায়িত্ব পুরোমাত্রায় পালন করে চলেন সেলিনা হোসেন।

'সোনালি ডুমুর' – উপন্যাসের দুটি অপ্রধান চরিত্র সুহাস আর আবদুল মালেক। এই দুই চরিত্র অপ্রধান হয়েও গুরুত্বপূর্ণ। পরস্পরের বিপরীত বিন্দুতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। এদের সংযোগসূত্র হল অনিমেষ। তার যাপিত জীবন ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে চরিত্র দুটি প্রাণ পেয়েছে। এরা দুজনে আসলেই দুটি ভিন্ন সত্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে। গবেষকের বিশ্লেষণাত্মক মন নিয়ে দেখতে গেলে মনে হয় সহজ ভাবে গল্পের টানে তাদের এসে পড়া নয়। বরং খুঁটিয়ে পড়লে মনে হয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এই চরিত্রদের এনে সহজ সত্য উচ্চারণই ছিল লেখিকার মূল গন্তব্য। সুহাস চরিত্রটি নোয়াখালি দাঙ্গার শিকার। আবদুল মালেক ভারতবর্ষের মুসলিম বিরোধী দাঙ্গার শিকার হয়ে সপরিবারে দেশ ছেড়ে 'রিফিউজি' নামের তকমা নিয়ে ঢাকার বস্তিতে এসে আস্তানা গেড়েছে। দাঙ্গার প্রত্যক্ষ রূপকে, তার ভয়াবহতাকে তারা কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছে। সুহাস তার পিতাকে হারিয়েছে। হারিয়েছে দিদিদের সতীত্ব। সামাজিক বঞ্চনার শিকার তার গোটা পরিবার। হিন্দু এই কিশোরের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত অন্ধকারের গর্ভে মুখ ঢেকেছে। ঠিক এতোটাই অনিশ্চয়তায় ঢেকে রয়েছে রিকশাওয়ালা আবদুল মালেকের জীবনও। 'রিফিউজি' নামের তকমা এঁটে দেওয়া হয়েছে তার ওপর। ভারতবর্ষ থেকে এসে পূর্ব পাকিস্থানে তাকে অসাম্য-বঞ্চনার শিকার হতে হয়। তাছাড়া ঘর ছেড়ে আসার দুঃখ তো আছেই। নতুন এই দেশের মাটিতে জীবন-জীবিকা-বিবাহ সব কিছুতেই তার ক্ষেত্রে নিয়মগুলি আলাদা ভাবে প্রযুক্ত হয়, যেহেতু সে রিফিউজি। আবদুল মালেকের পিতা দেশ ছাড়ার যন্ত্রণায় মানসিক রোগের শিকার হয়। সীমাহীন দারিদ্র্য তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় হতদরিদ্র এরকম অনেক পরিবারকে যারা সীমানার ওই প্রান্ত থেকে চলে এসেছে প্রাণরক্ষার তাগিদে। সুহাস আর আবদুল মালেকের অবলম্বন হয়েছে অনিমেষ। অথচ তার নিজেরও মধ্যে সেই কষ্টই বাসা বেঁধে রয়েছে। যদিও তা স্থূলতার পর্যায়ে পৌঁছোয়নি। নিজের শৈশবের গ্রাম ছেড়ে আসার চোরা-দুঃখ মনের মধ্যে গুনগুন করে বাজতে থাকে। সরোজিনী-অমিয়নাথের চোখে এই কষ্টকে জন্ম নিতে দেখেছিল যে বালক অনিমেষ, যৌবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও তাকে সে ভুলতে পারেনি। তাই হয়ত এই ঘরহীন মানুষগুলির সঙ্গে অনিমেষ সাযুজ্য অনুভব করে।

> "...কিন্তু আত্মিকভাবে আমেরিকান হয়ে ওঠা গোগোল নিজে কোনওদিন মানতে পারেনি ওই নাম। ভারতীয় শিকড়কেই কি সে মানতে পেরেছিল? শিকড় ও শিকড়হীনতার, প্রবাসকে নিজের করে নেওয়ার, পুরনো ও নতুন জীবনের মাঝখানে ত্রিশঙ্কু হয়ে থাকার, আত্মিক সংকট উপলব্ধি করার কাহিনী ধরা পড়েছে এই আখ্যানে।"[১৮]

ঝুম্পা লাহিড়ীর 'সমনামী' উপন্যাসে গোগোল গাঙ্গুলি নামক একজন অভিবাসী বাঙালীর জীবন কতটা জটিল হয়ে উঠতে পারে, অস্তিত্বের সংকট তাকে কতটা পীড়া দিতে পারে, পিতা-মাতা থেকে প্রাপ্ত দেশজ সংস্কৃতি ও জন্মসূত্রে অর্জিত আমেরিকান সংস্কৃতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলা তার পক্ষে কতটা কঠিন, সেই দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। 'সোনালি ডুমুর'-এর অনিমেষের সংকটও কিছুটা এরকমই। তবে চরিত্রগত ভাবে তা আলাদা। ভারত-বাংলাদেশের টানাপোড়েনের মাঝে দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব ও অবস্থান বিষয়ক এমত প্রশ্ন তাকেও নাড়িয়ে দিয়ে যায়, -

> "অনিমেষ টিচার-কমনরুম থেকে বের হয়ে আসতে আসতে ভাবে, তাহলে কোন দেশ তাদের? ইন্ডিয়ায় গেলে তো লোকে ওদের রিফিউজি বলে। ওরা কি তাহলে দেশহীন মানুষ?"[১৯]

এই উদ্ধৃতি বুঝিয়ে দেয় আজ থেকে সত্তর বছর আগে কিভাবে অভিবাসী ভারতীয়ের থেকেও আরো বেশি সংকটাপন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল দেশভাগের ক্ষত বুকে নিয়ে বাঁচা উদ্বাস্তু মানুষ, যেখানে নিজের দেশেই তারা 'রিফিউজি'-র তকমা

পায়। এই দেশভাগ ও তৎপরবর্তী দাঙ্গা মাধুরীলতার মনে আগুন জ্বেলে দেয়, "মাধুরীলতা হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, আমরা দেশহীন মানুষ। এই দেশে আমাদের জন্য নদী আছে, গাছ আছে। দরকারমতো নদীতে ডুবে মরব, গাছে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলব।"[২০] শব্দের এই তীব্র, তীক্ষ্ণ ব্যবহার অসহায়, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষের আর্তনাদকে বাঙ্ময় করে তোলে।

এই উপন্যাসে প্রকৃতির কথা আসে। নদীর কথা আসে। উন্মুক্ত প্রান্তর, পাখি, গাছগাছালির কথা আসে। প্রকৃতিও এই উপন্যাসের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আসলে। এই প্রকৃতি অনিমেষের অস্তিত্বেরও দ্যোতক। অনিমেষ চরিত্রকে খনন করতে গেলেই প্রকৃতির আলোকবৃত্তে পৌঁছে যেতে হয় পাঠককে। উপন্যাসের শুরুতেই দশ বছরের বালক অনিমেষকে দেখা যায় চাকদহ থেকে ফেরার পথে ফড়িং ধরে, বুনোফুল খুঁজে বেড়াতে। নদীর তীর তাকে আকর্ষণ করে। চাঁদপুরে এসেও সে বাবাকে বলেছে পাখি, ধানখেত, গাছগাছালি কত সুন্দর। কখনো সে কাঁচা বাঁশের বেড়ার সোঁদা গন্ধ শোঁকে। মা-জেঠিমার জন্য বাড়ির উঠোনে ফুলগাছ লাগাতে চায়। আকাশের জ্যোৎস্নার ভাগ সে একাই নিতে চেয়েছে। বন্ধুদের হাত ধরে নদীর পাড় ধরে দৌড়োয় সে। বুকে ভরে নেয় নদীর বাতাস। চাঁদপুরে গিয়ে নতুন করে স্বাধীন জীবনের স্বাদ পেয়ে সরোজিনীর মনে হয় তার ভেতরে এক ঝাপটা শিউলির গন্ধ ঢোকে। অনিমেষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে মাধুরীলতা বেণীতে গাঁথা সাদা ফুল দেয়। সেই সাদা ফুল হয়ে ওঠে তাদের বন্ধুত্বের প্রতীক। প্রেমেরও প্রতীক। মাধুরীলতার দাদু ভূদেব দত্তের মধ্যেকার শূন্যতা বোঝাতে ধূ-ধূ রুক্ষ প্রান্তরের তুলনা দেওয়া হয়। কোনো এক কাক-ডাকা সন্ধ্যায় মাধুরীলতা তার দিদিমার মৃত্যুবার্তা বয়ে এনেছে। সতীশ মজুমদারের যখন মনে হয়েছে দাঙ্গার পরে কাজিরখিল গ্রামের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে, তখন অনিমেষ তাকে গ্রামের পাখির ডাক, ফুলগাছের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। মেঘনা নদীর পাড়ের ছেলে অনিমেষকে সতীশ সাহসী হতে বলে। সতীশ ও পুরোহিতের সমবেত ক্রন্দনের সাক্ষী অনিমেষের মন ভালো হয়ে যায় একসময় নিমগাছে বসে থাকা একঝাঁক চড়ুইয়ের কিচিরমিচির শুনে। গান্ধীজির জয়াগে যাওয়ার সময়ের বর্ণনায় প্রসঙ্গক্রমে আসে মাঘের কুয়াশা আবৃত ভোরের কথা। পূর্ণিমার চাঁদের প্রসঙ্গও উপন্যাসে বারবার আসে। গ্রাম ছাড়ার সময় নিজের কবুতর আর মুরগিদের মাধুরীলতা পাপিয়ার কাছে দিয়ে যায়। তার যাত্রাপথের বর্ণনায় নদী ও নৌকার উল্লেখ রয়েছে। কুমিল্লায় লেখাপড়া করতে গিয়েও প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে রেখেছে অনিমেষ, "...দেখতে পায় অন্ধকার, চাঁদের ফিকে আলো, আকাশ, অজস্র তারা, জোনাকির ফুটিফাটি আলো, কোনও পোকার শব্দ এবং চাঁদের আলোয় নিজের ছায়া।"[২১] কুমিল্লায় থাকাকালীন অনিমেষ তার বন্ধুদের সঙ্গে অবসর সময়ে গোমতী নদীর ধারে হেঁটে বেড়াত, "ওরা চারজন নদী দেখতে দেখতে সোজা হয়ে বসে। ঘাসের ওপর পা মেলে দেয়।... এই নদী মেঘনা নদীর সঙ্গে মিশেছে। মেঘনা চাঁদপুরের নদী। নদী তো বইবেই। মৈত্রীর মেলামেশায় একের সঙ্গে মিলেমিশে দুঃখের স্রোতকে সাগরে নেবে...।"[২২] এই উদ্ধৃতির আলোকে দেখলে 'সোনালি ডুমুর'-কে নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস বললেও অত্যুক্তি হবে না। কুমিল্লার সম্মানীয় ব্যক্তি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ির উঠোনে ছিল শিউলি ফুলের গাছ। ফুল পড়ে গাছতলা সাদা হয়ে থাকে। তাঁর বারান্দায় কাক-শালিক-চড়ুই খাবার খুঁটে খেতে ভিড় জমাতো। ছেলের দল বুনোফুল দিয়ে প্রণাম জানায় বৃদ্ধ উকিলদাদু ধীরেন্দ্রনাথকে। নিমেষ সুহাসকে ভরসা দিতে গিয়ে দূর আকাশে ভাসমান সোনালি ডানার চিলের ছবি দেখায়। নাগলিঙ্গম ফুলকে তারা উপহার হিসাবে নির্বাচন করেছে। কুমিল্লা থেকে ফিরে শ্মশানে গিয়ে শূন্য শ্মশানে অনিমেষ নেড়ি কুকুর ঘুরতে দেখে। দেখে কাক-শালিক-বুলবুলি-ফিঙে-বটগাছের ছায়াকে। এরা তাকে মাধুরীলতার কথা আরও বেশি করে মনে করিয়ে দিয়েছে। ডাক্তার মন্মথনাথ নন্দীর চরিত্রকে প্রকাশ করতে সেই প্রকৃতিরই আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। অনিমেষের মতোই ডাক্তার নন্দীও নদী পরিবৃত হয়েছিলেন জীবনের এক পর্বে, "আমি যখন বিক্রমপুরে ছিলাম তখন আমি গয়নার নৌকায় করে ঢাকায় আসতাম। বিক্রমপুরের একদিকে আছে পদ্মা, আর একদিকে ধলেশ্বরী। আর পূর্ব দিকে ছিল মেঘনা। এক তিনটি নদী চাঁদপুরের কাছে মিলিত হয়েছে। এই জায়গা আমার কাছে সাগরের মতো। ওখানে গেলে আমি ভাবতাম সাগরে এসেছি।"[২৩] মন্মথনাথ নন্দী এবং অনিমেষ দুই চরিত্রকেই আসলে নদী-সাগরের উপমা দিয়ে মহনীয়তায়-গভীরতায়-ঔদার্যে নিয়ে আসতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। এখানেও প্রকৃতি তাঁকে ভাষা যুগিয়েছে। জ্যোৎস্নার আলো হয়ে ওঠে মাধুরীলতা-অনিমেষের মিলনের সাক্ষী।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 283
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পূর্ণিমার রাত ও চাঁদের জ্যোৎস্না যেমন উপন্যাসে মিলনের, কবিতার, প্রেমপ্রীতির অনুষঙ্গ নিয়ে আসে, তেমনি এখানে সেই চাঁদের খন্ডাংশ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে 'চাঁদের বুড়ি'-র এক নিজস্ব অবয়ব। সুহাসের তিন দিদিকে 'চাঁদের বুড়ি'-র ফোকমিথের নামে নামাঙ্কিত করে আসলে ধর্ষিতা-অভিশপ্ত তিন নারীর জীবনে নেমে আসা সামাজিক স্টিগমাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন লেখিকা। এই 'চাঁদের বুড়ি'-রা আসলেই মানুষের চোখে পরিত্যক্তা। চাঁদ থেকে মাটির বুকে নেমে আসা হয়ে উঠবে না তাদের। সমাজের বুকে থেকেও কোনোদিন সামাজিক স্বীকৃতিটুকু পাবে না তারা। এই 'চাঁদের বুড়ি'-র কনসেপ্ট জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন'-এর 'বুড়ি চাঁদ'-কে মনে করিয়ে দেয়, যে একদা বেনোজলে ভেসে গিয়েছিল। অন্যদিকে মিনতিরাণী কুন্ডুর পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে 'চাঁদের রাজকন্যা'-র মিথ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রকৃতির অঙ্গ হিসাবে উপন্যাসে পাখির একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। সেই 'পাখি'-র রূপকেও নানা ভাবে ঔপন্যাসিকের কাব্যিক চেতনা ডানা মেলেছে। পাখির প্রসঙ্গ এসেছে কাহিনীতে একাধিকবার। ঘুঘুর ডাকে অন্যমনস্ক হয় সরোজিনী। চাঁদপুরে এসেই অনিমেষের মনে হয় বুলবুলির লাল রঙে সে একটি সূর্য বানাবে। পাখপাখালির সঙ্গে তার আলাদা মিতালি – 'রাস্তায় এসে আমি মোয়া-মুড়ি পাখিদের খেতে দিই। পাখিরা লাফিয়ে লাফিয়ে মোয়া-মুড়ি খায়। একটু দূরে উড়ে যায়।' এতো কাছ থেকে পাখিদের জানাচেনার পরেও অনিমেষ কিন্তু পাখি হতে চায়নি। বরং মায়ের কাছে সলজ্জভাবে জানিয়েছে সে নদী হতে চায়, "ও একটুক্ষণ চিন্তা করে বলে, না পাখি ভাবি না। আমি নিজেকে নদী ভাবতে ভালবাসি। নদীর সঙ্গে সমুদ্রের যোগ আছে। ওটা অনেক বড় জায়গা।"[২৪] বাবাকে অনিমেষের বড় পাখি মনে হয়, মাকে টুনটুনি পাখি। কথায় কথায় বোন দোলাকে অনিমেষ বলেছে – 'দোলা দেখ দেখ কী সুন্দর একটা পাখি। কই দাদা? ওই যে গাছের মাথায়। দেখতে পেলি না? ওই দেখ উড়ে যাচ্ছে। থাকগে। রোজ রোজ কত পাখি দেখি। আমার পাখি দেখা ফুরায় না।'[২৫] সরোজিনী তার কপালে চুমু খেলে অনিমেষের মনে হয় অসংখ্য পাখি কিচকিচ করছে। কখনো আবার মায়ের কণ্ঠ তার ঘুঘু পাখি ডাকের মতো মনে হয়। রাতপাখি শামকুকড়ার ডাকে সরোজিনী স্বামীকে আঁকড়ে ধরে। মাধুরীলতার দিদিমার মৃত্যুর সংবাদে অনিমেষের মনে হয় সে যেন পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ পাচ্ছে। মাধুরীলতা দিদিমার পালিত হাঁসেদের দেখাশোনা করে।

এভাবেই প্রকৃতির বর্ণনা একাধিকবার এসেছে উপন্যাসে। এসেছে পাখির কথা। নদীর কথা। চরিত্রের ব্যপ্তি ও গভীরতা বুঝিয়ে দিতে। তা গদ্যের কাব্যিকতা, তার চিত্ররূপময়তার ধর্মকে প্রকট করে। অনিমেষের ঢাকায় যাওয়ার পর, নগরজীবনের প্রেক্ষাপটে এসে এই চরিত্রের প্রকৃতি লগ্নতা কিছুটা কমেছে। তবে সেখানেও পাখি তার সঙ্গের সঙ্গী হয়েছে, ঢাকায় বন্ধু নাজমুলের সঙ্গে রেস্তোরায় বিরিয়ানি খেতে খেতে একমুঠো বিরিয়ানি অনিমেষ কাকদের খেতে দিয়েছে।

পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো উপন্যাসের কথনপ্রণালী স্তরে স্তরে উন্মোচিত হতে থাকলে এর অন্তর্গত চরিত্রগুলির দেহভাষার প্রয়োগও পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। এই চরিত্ররা শুধু মুখের সংলাপে নয়, বরং শারীরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, দৈহিক অঙ্গভঙ্গীতে সবাক-সচল সত্তা রূপে প্রতীয়মান হয়। বর্ণনার বিশেষ ভঙ্গিতে তাদের প্রত্যক্ষ করতে পারা যায় যেন। ঔপন্যাসিকের নৈর্ব্যক্তিক বয়ানে মিশে যায় প্রত্যক্ষ ভাষণ, যেমন- 'হি হি করে হাসে ওরা', 'ওয়াহেদ মিয়ার সাঙ্গপাঙ্গরা হেঁ হেঁ হাসিতে বাজার মাতিয়ে তোলে', 'অনিমষ উসখুস করে', 'গলা খেঁকায়', 'অনিমেষের মতো খুশিতে হে-রে-রে-রে করতে থাক', 'ও নিজের ভেতরে চুপসে যায়', 'অমিয়নাথ বুকের কাছে দু'হাত জড়ো করে বলে', 'অনিমেষ দু'হাত মাথার উপর তুলে বলে', 'ও আনন্দ-উচ্ছাসে ঘুরপাক খায়', 'দ্রুতপায়ে হেঁটে আসছে সে', 'হারাণ ওর দিকে গরম চোখে তাকায়', 'লাফিয়ে ওঠে হারাণ', 'প্রফুল্ল রাগে গঁ-গঁ করে', 'তিনজন হুটোপুটি করে। মাঠজুড়ে দৌড়ায়', 'সরোজিনী নিজের এ ভাবনায় নড়েচড়ে ওঠে', 'মাধুরীলতা ঘাড় টান করে বলে', 'মাধুরীলতা ভুরু কুঁচকে বলে', 'ও ঘাড় কাত করে বলে', 'পুরোহিত চোখ মোছেন। চুলে হাত ঢোকান', 'মন্দিরা দু'হাতে তালি বাজিয়ে বলে', 'মন্দিরা আঙুল তুলে শাসায়', 'মন্দিরা হুটপটিয়ে বলে', 'মাধুরীলতা ঘুঁষি পাকিয়ে বলে', 'মাধুরীলতা দু'হাতে মাথা চেপে ধরে' – এরকম উদাহরণ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। চরিত্রদের এই শরীরী বর্ণনা, দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত বিবরণ তাদের পাঠকের কাছে সপ্রাণ যেমন করে তোলে, তেমনি কাহিনীর ঘটনাধারায় গতিপ্রদান করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 283
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেলিনা হোসেনের লেখা 'সোনালি ডুমুর' একটি ইতিহাসের কথা বলে। দেশভাগের বিবর্ণ অধ্যায়ের পাশে সেখানে উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের কথা। ঢাকা শহরে সামরিক শাসনের চোখ-রাঙানিকে অগ্রাহ্য করে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করেছে মানুষ। নজরুল ইসলামের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের কথা এসেছে অনিমেষের নজরুলগীতি শেখার প্রসঙ্গে। নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধের কথা বলে স্বাধীনতা আন্দোলনের আগুনকে উস্কে দিতে চেয়েছেন সেলিনা হোসেন। উপন্যাসে সব থেকে বেশি এসেছে যে ঐতিহাসিক চরিত্রের কথা, তিনি হলেন গাঁধীজি। মহাত্মা গান্ধী। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে দাঙ্গার সময় গাঁধীজি সেখানে আসেন। দাঙ্গা থামানোর জন্য তিনি অনশন করেন। পরিস্থিতি শান্ত হলে পরে পঁচিশ দিন পরে তিনি অনশন ভাঙেন। তিনি স্থানীয় মানুষকে শান্তি-সম্প্রীতি-অহিংসার-প্রেম-ভালোবাসার কথা বলেন। তিনি শান্তি মিশন স্থাপন করেন। গ্রামের পর গ্রাম কর্দমাক্ত পথ পায়ে হেঁটে চলেন তিনি। টানা চারমাস নিজের কর্মীবাহিনীকে নিয়ে কাজ করে চলেন নোয়াখালিতে। সমাজসেবার উদ্দেশ্যে জয়াগে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। পানিয়ালাতে আশ্রম স্থাপন করেন। নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ত্রাণকার্যে এগিয়ে আসেন সুচেতা কৃপালনি, অশোকা গুপ্তের মতো মানুষ। এরপর গাঁধীজি বিহারে দাঙ্গাপীড়িত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। এই 'গাঁধী' চরিত্রকে রোল মডেল হিসাবে দাঁড় করিয়ে দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতার অশান্ত পরিস্থিতিকে ভারসাম্য দিতে চাওয়া হয়েছে। সুতরাং এই চরিত্রটিকেই উপন্যাসের রোল মডেল বললে অত্যুক্তি হবে না।

সেলিনা হোসেনের 'সোনালি ডুমুর'-এর তুলনা-প্রতিতুলনায় আসতে পারে মিহির সেনগুপ্তের 'বিষাদবৃক্ষ' উপন্যাসটির কথা। এটি একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এই বইতে এসেছে পূর্ব পাকিস্তানের ভূভাগে ১৯৫০ পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা,

> "পঞ্চাশ-একান্নর দাঙ্গাই এখানে এক বীভৎস কাঁপন ধরিয়ে দিলে, প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো সামাজিক ভিতে ফাটল ধরল।"[২৬]

সেই দাঙ্গায় বিধ্বস্ত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের কথাও এখানে এসেছে 'সোনালি ডুমুর'-এর মতোই। সাহিত্যে লেখকের এক অশান্ত পরিবেশে সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে বড় হয়ে ওঠার কথা, তার প্রতিবন্ধকতার কথা বলা হয়েছে। লেখক এখানে দেশভাগ-দাঙ্গা-ধর্ম সবকিছুকেই নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে থাকা হিন্দু বাঙালি সম্পর্কে যে তথ্য লেখক দিয়েছেন, তা 'মরিচঝাঁপি' গ্রন্থের সত্যতাকেই মর্যাদা দেয়, '...এ-রকম আরও কিছু ঘটনা ক্রমশ ঘটতে থাকলে আমরা পিছারার খালপাড়ের অপবর্ণীয় মানুষেরাও যেন তাদের দেশ, ভূমি এবং এতকালের আশ্রয়ের বিষয় আস্থাহীন হয়ে পড়ে। তারা এক অনির্দেশ যাত্রায় ক্রমশ উদ্যোগী হতে থাকে। এর আগের প্লবতায় গ্রামগুলো বনেদি পরিবারগুলোকে হারাচ্ছিল, এখন সাধারণ মানুষগুলো পর্যন্ত বাস্তুত্যাগ করত শুরু করল।'[২৭] এই 'অনির্দেশ যাত্রা'-র কথাই বলছে 'সোনালি ডুমুর'-ও, যেখানে অমিয়নাথ-সরোজিনীর কথা থেকে বোঝা যায় তাদের গ্রামের বেশিরভাগ অবস্থাসম্পন্ন, শিক্ষিত মানুষই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। সেসব সম্পত্তি দখল হয়েছিল মুসলমান কর্তৃক। কিন্তু তখনো শ্রমিক-কর্মী মানুষ আশায় আশায় ছিল যে দেশভাগ হয়ত তাদের প্রত্যক্ষত আঘাত করবে না, "মুসলিম লিগ এবং পাকিস্তানপন্থীরা এ-কথা লিখিতভাবেও রেখেছেন যে, তাদের বিরোধ শুধুমাত্র উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের সাথেই। তাঁরা চান যেন উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা এদেশে না থাকেন। এ-সব কথা আমরা পাঁচের দশকের শুরুতেও বিভিন্ন জমায়েতে শুনেছি। কিন্তু একটা সময় এই প্রতিজ্ঞা আর থাকেনি।"[২৮] ক্ষমতার এই ডায়নামিকস্ যে বদলাচ্ছিল, সর্বস্তরের মানুষকেই ক্ষমতাগর্বী সংখ্যাগুরু মানুষেরা কোনঠাসা করছিল, সেকথা তো অমিয়নাথ ও তার দাদার সপরিবারে চাকদহে চলে যাওয়া থেকেই প্রমাণ হয়। দেশ তারাও ছেড়েছিল একরকম বাধ্য হয়েই, পরিবর্তনশীল সমাজ-পরিস্থিতি বিচার করে যেখানে কৃষক-শ্রমিক-কারিগর, সমাজের নিম্নবর্গের মানুষরাও আর পাকিস্তানের মাটিতে দমন-পীড়ন থেকে রক্ষা পাচ্ছিল না। 'সোনালি ডুমুর'-এর অনিমেষের সঙ্গে 'বিষাদবৃক্ষ' এর মিহির সেনগুপ্তের আশ্চর্য রকম মিল পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুটি গ্রন্থ পাশাপাশি রেখে দেখলে বোঝা যায়, সেলিনা হোসেনের লেখায় রয়েছে রূপকথার আদল। ক্রমাগত দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সত্ত্বেও অনিমেষ-মাধুরীলতা-অমিয়নাথের মধ্যেকার সংকটকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে মাধুরীলতা-অনিমেষের প্রেমের আখ্যান জয়যুক্ত হয়। এই লেখায় যেন রূপকথার মতো নৈর্ব্যক্তিক অ্যাপ্রোচ, অনির্দিষ্টতা, ভাষার কাব্যময়তা, পুনরাবৃত্তিময়তা, দুর্বলের জয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 283
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সবলের পরাজয়ের অতি পরিচিত ইমেজ এবং ফোক স্যাটিসফেকশনের কথা বলতে চাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ‘বিষাদবৃক্ষ’-তে দেশভাগ পরবর্তী সময়কালে সংখ্যালঘু সমস্যার ভয়াবহতাকে প্রকট ভাবে বর্ণনা করা হয়। তবে সেখানেও যে কিছু চড়া দাগের আঁচড় থাকে না, তেমন নয়। অনেক সময় পরিস্থিতিকে হয়ত একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা বা দেখানোর প্রয়াসও নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। তবে মুসলমান অধ্যুষিত ভূখন্ডে এক হিন্দু কিশোরের জীবন সংগ্রামের চিত্রকে কম গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত নয়। এবং ভিন্নতার পাশাপাশি পৃথক ধর্মের মানুষের সম্মিলিত সহাবস্থান ও পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা সেই আত্মজীবনীতেও আছে। মূল আঙ্গিকগত ভিন্নতা সত্ত্বেও একই সময়কালকে তুলে ধরার জন্যই সেলিনা হোসেন এবং মিহির সেনগুপ্তের লেখায় কিছু সূত্রগত মিল লক্ষ্য করা যায়, যা আসলে ‘সোনালি ডুমুর’-এর ঐতিহাসিক সত্যতারই প্রামাণ্য নিদর্শন। মধুময় পাল সম্পাদিত ‘মরিচঝাঁপি – ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস’ গ্রন্থটিও ১৯৬০-এর পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ভূখন্ডে সংখ্যালঘু হিন্দু বাঙালির নিম্নবর্গের মানুষের ওপর হয়ে চলা বৈষম্য ও তাদের দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এসে দাঁড়ানো ও সেখান থেকে দন্ডকারণ্যের মাটিতে স্থানান্তরণের কঠিন সত্যই উচ্চারণ করেছে। সুতরাং অপরাপর টেক্সটের রেফারেন্স টেনে এনে সেলিনা হোসেনের গবেষণা প্রসূত লেখনীর ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় করা যায়।

যে কোন রকম সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভ্রাটকে কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আর সচেতনতা, এ হল সেলিনা হোসেনের নিজের বিশ্বাস, ‘আমরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি। এর জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই, কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন মানুষের সচেতন হয়ে ওঠার হাজার দরজা খুলে দেওয়া।’[২৯] সেই সচেতনতাকে জাগিয়ে তুলতেই হয়ত দেশভাগ নিয়ে গড়ে ওঠা যাবতীয় ধূসর এলাকাকে স্বচ্ছতা স্পষ্টতা দিতে কলম ধরেন ঔপন্যাসিক। ‘সোনালি ডুমুর’ লাল ফুল – সাদা ফুলের রূপকের কথা বলছে। সূচিত করছে মানুষের গ্রামের দিক থেকে নগরমুখী হওয়াকে। উকিল ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাক্তার নন্দী, অমিয়নাথের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া হয়েছে যে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া মনুষ্যত্বের অপমান। ফয়েজ আহমদের মতো প্রতীকী চরিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। এবং দাঙ্গার আগুনে মানুষের জীবন-যৌবন-বার্ধক্য পুড়ে ছারখার হওয়ার মতো যাবতীয় ঘটনাবহুল এপিসোডের পর ডাক্তার নন্দীর মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া হয়েছে,

> “দাঙ্গা আর বন্ধুত্ব এই পূর্ব বাংলায় আমাদের নিয়তি। হা-হা-হা। এসব নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।”[৩০]

দাঙ্গা বিষয়ক সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে এই সত্যই হয়ত ঔপন্যাসিকের উপলব্ধি এবং আশা-ভরসা বটে। বন্ধুত্বকে দাঙ্গার সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করার মতো মনের জোর অর্জন করা – সুবিশাল উপন্যাস পাঠের অন্তে পাঠকেরও বোধহয় এটুকুই প্রাপ্তি।

Reference:

১. হোসেন সেলিনা, সোনালি ডুমুর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ২৩৯
২. ঘোষ সুদক্ষিণা, মেয়েদের কলম ঘরে বাইরে, কারিগর, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ২৫০
৩. হোসেন সেলিনা, সোনালি ডুমুর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ২০১
৪. পাল, মধুময় (সম্পাদনা), মরিচঝাঁপি – ছিন্ন দেশ ছিন্ন ইতিহাস, গাঙচিল, কলিকাতা, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ২১২
৫. হোসেন সেলিনা, সোনালি ডুমুর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ২৮০
৬. তদেব, পৃ. ৫৫
৭. তদেব, পৃ. ৯৯
৮. তদেব, পৃ. ৮৫
৯. তদেব, পৃ. ১৫৩
১০. তদেব, পৃ. ১০৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 283
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১১. তদেব, পৃ. ২৪৬
১২. তদেব, পৃ. ১৭২
১৩. তদেব, পৃ. ২৬৫
১৪. তদেব, পৃ. ১৬
১৫. তদেব, পৃ. ৫১
১৬. তদেব, পৃ. ৮৩
১৭. তদেব, পৃ. ২৭২
১৮. লাহিড়ী ঝুম্পা, *সমনামী* (অনুবাদক-পৌলমী সেনগুপ্ত), আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০০৫ (প্রথম আনন্দ সংস্করণ), পৃ. গ্রন্থমলাট
১৯. হোসেন সেলিনা, সোনালি ডুমুর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ৭৫
২০. তদেব, পৃ. ৮২
২১. তদেব, পৃ. ১২৩
২২. তদেব, পৃ. ১৭০
২৩. তদেব, পৃ. ২১২
২৪. তদেব, পৃ. ৪৯
২৫. তদেব, পৃ. ১৬৩
২৬. সেনগুপ্ত মিহির, উজানি খালের সোঁতা, আনন্দ, কলিকাতা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১৪৩
২৭. তদেব, পৃ. ১৩৭
২৮. তদেব, পৃ. ১৭৮
২৯. হোসেন সেলিনা, ঘরগেরস্থির রাজনীতি, কারিগর, কলিকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৯৩
৩০. হোসেন সেলিনা, সোনালি ডুমুর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ২৭৩

Bibliography:

হোসেন, সেলিনা, সোনালি ডুমুর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২
ঘোষ, সুদক্ষিণা, মেয়েদের কলম ঘরে বাইরে, কারিগর, কলকাতা, ২০১৫
পাল, মধুময় (সম্পাদনা), মরিচঝাঁপি – ছিন্ন দেশ ছিন্ন ইতিহাস, গাঙচিল, কলিকাতা, ডিসেম্বর ২০০৯
হোসেন, সেলিনা, ঘরগেরস্থির রাজনীতি, কারিগর, কলিকাতা, জানুয়ারি ২০১৩
সেনগুপ্ত, মিহির, উজানি খালের সোঁতা, আনন্দ, কলিকাতা, জানুয়ারি ২০০৬